আজকের কাগজ 24

তারিখ 09 MAY 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

সরকারী কলেজের প্রশাসনিক উন্নয়ন—১

ডঃ আলী আহমেদ

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। উচ্চশিক্ষার কলেজগুলোসহ সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও প্রশাসনের সর্বপ্রধান দায়িত্বও একই মন্ত্রণালয়ের। এই প্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার সরকারী কলেজগুলোর শিক্ষানীতিসহ তার পরিচালনা ও প্রশাসনের মূল দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপরই ন্যস্ত। এর অধীনে ও সরাসরি নিয়ন্ত্রণে কাজ করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। সরকার নির্ধারিত নীতিমালা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব পালন ও নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদান করাই এর কাজ। অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে সরকারী কলেজগুলো উচ্চশিক্ষা পরিচালনা করে থাকে। নির্বাহী কাজের সর্বশেষ স্তরে অবস্থিত কলেজগুলোর প্রধান দায়িত্ব হলো, ছাত্র-ছাত্রীদের এমন এক আদর্শিক গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা যাতে তারা ভবিষ্যতে বাস্তবিক কর্মক্ষেত্রে সাহসের সাথে নানাবিধ গুরুদায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করার উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়াস পায়। সুতরাং, এই উদ্দেশ্যেই কলেজগুলো পরিচালিত হয়।

প্রশাসন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর অধীনে সহায়করূপে নিয়োজিত রয়েছেন সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপ-সচিব ও সহকারী সচিবগণ। অধিদপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা মহাপরিচালক, তাঁর অধীনস্থ পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালকবৃন্দ ও শিক্ষা অফিসারগণের সহায়তায় কার্যনির্বাহ করেন। কলেজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা—অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাজে সহায়তা করার জন্য রয়েছেন সহ-অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ ও প্রশাসনিক কর্মচারীগণ। এরূপ প্রশাসনিক কাঠামোয় কলেজের নিয়মিত কাজ সম্পাদিত হয়। শিক্ষার্থীরা এর দ্বারা উপকৃত হয়। প্রশাসনিক কাঠামো যে ধরনেরই হোক না কেন এতে উপযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির সমাবেশ না ঘটলে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে না। সে কারণে কলেজগুলোর সুচারু পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক কাঠামোয় উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগের সঠিক নীতিমালা থাকা উচিত এবং এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের স্বতন্ত্র নিয়োগ-পদ্ধতি ও নীতি থাকায় আমার এই নিবন্ধে তাঁদের আলোচনায় না গিয়ে বরং অধিদপ্তর ও বিশেষতঃ কলেজগুলোয় অধিকর্তা নিয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা নিয়ে স্বল্প-বিস্তর আলোচনা করা হলো। প্রথমতঃ অধিদপ্তরের কথায় আসা যাক।

প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দ ও নির্বাচিত গ্রেডের অধ্যক্ষগণের মহাপরিচালক পদে উন্নীত হওয়ার অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। অবশ্যই মহাপরিচালক হবেন শিক্ষা সার্ভিসের একজন প্রবীণ সদস্য- এ কথা উল্লেখ করা অনাবশ্যক। তথাপি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে দুটো অনিয়মিত নিয়োগ সাধিত হয়েছে।

বর্তমানে অনুসৃত নিয়মাবলীতে মহাপরিচালককে নির্বাচিত গ্রেডের অধ্যক্ষ হতে হবে- এ ধরনের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও সুনির্দিষ্ট এরূপ শর্তের একটি নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিদপ্তরের পরিচালক থেকে মহাপরিচালক হওয়ার পূর্বে তাঁকে কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তবিক অভিজ্ঞ হতে হবে। সে জন্যে তাঁকে অবশ্যই অন্ততঃ এক বছরের জন্য হলেও কলেজ প্রশাসনে সিলেকশন গ্রেড অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ মহাপরিচালক হিসাবে সার্থকভাবে কলেজগুলোর নিয়ন্ত্রক-কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য পূর্বেই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন অত্যন্ত জরুরী।

উল্লেখিত শর্ত বিবেচনায় শিক্ষা সার্ভিসের উক্ত তিন সদস্যের নিয়োগ প্রচলিত নিয়মের বহির্ভূত না হলেও বাঞ্ছিত ছিল না; কারণ তাঁরা সিলেকশন গ্রেড অধ্যক্ষের দায়িত্ব কখনই পালন করেননি। অধিকন্তু, কোন কোন মহাপরিচালক নিয়োগ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয়নি, সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড, কাউন্সিল কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে জ্যেষ্ঠতার নিয়ম লংঘন করে সম্পাদিত হয়েছে। শিক্ষা পরিদপ্তরের অন্যান্য অধিকর্তা পদে সাধারণতঃ মহাপরিচালকের পরামর্শে কলেজ শিক্ষকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিকে মন্ত্রণালয় নিয়োগ প্রদান করে। উল্লেখ্য এই সকল কর্মকর্তাদের নিয়োগের পূর্বে তাঁদের প্রশাসনিক যোগ্যতা ও দক্ষতা বিচার করা উচিত। কারণ, একজন সুশিক্ষক সর্বদাই একজন যোগ্য প্রশাসক হবেন- এরূপ বলা যায় না। অপরপক্ষে, একজন দক্ষ প্রশাসক-পরিচালকের অবশ্যই সুশিক্ষক হওয়ার নিশ্চয়তা নেই। তবুও শিক্ষা পরিচালনায় ব্যাপক ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এরূপ সুশিক্ষক আছেন, যাঁরা প্রশাসনেও দক্ষ। তদ্রূপ অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিই অধিদপ্তরের পরিচালক পদের জন্য নির্বাচিত হলে তবেই কলেজ প্রশাসনে আবশ্যকীয় সহায়তা প্রদান ও লক্ষ্য অর্জনে তাঁরা উপযুক্ত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন এবং গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে তা যথেষ্ট সহায়ক হবে।

চাকরি পদ্ধতি ও মেয়াদ

সাধারণতঃ দেখা যায়, পরিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্যতীত অন্যান্য অধিকর্তাদের কয়েক বছরের দাপ্তরিক সার্ভিসের পর চাকরিতে পদোন্নতি দিয়ে কিংবা শিক্ষা বোর্ডে বদলি করে সরিয়ে নেয়া হয়। হয় তাঁরা কলেজে ফিরে যান, না হয় অন্যত্র স্থানান্তরিত হন। কিছুকাল দপ্তরে বহাল থাকার পর যখন তাঁরা পরিদপ্তরের কর্মকান্ড সম্বন্ধে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হন তখনই এরূপ বদলি হয়। তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ব্যবহৃত হয় না। এই পদ্ধতি অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এরূপ স্থানান্তর সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বরং আরও দীর্ঘকাল পরিদপ্তরের নিয়মিত কাজে বহাল রেখে পদোন্নতির সময় উপস্থিত হলে তখন পরিদপ্তরেরই উচ্চতর পদে তাঁদের উন্নীত করা উচিত। পরিদপ্তরের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য এটি কার্যকরী হবে। অবশ্য পরিদপ্তরের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের সুযোগ প্রদান করার পর তাঁদের কলেজে ফিরিয়ে নেয়ায় কোন অসুবিধা নেই।

কলেজ শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগের নিয়মিত পদ্ধতিতে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক উপযুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষক-প্যানেল গঠন করা হয়। কলেজ শিক্ষক পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্য ব্যক্তি হবেন, কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক সম্মান ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও শিক্ষাজীবনে এসএসসি ও এইচএসসিতে কোন তৃতীয় শ্রেণীবিহীন প্রার্থী। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্নের প্রার্থী কোনক্রমেই বিবেচ্য নয়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্বাচন মাধ্যমই স্বজনপ্রীতি, অনুগ্রহ বা প্রিয়পোষণ প্রবণতারোধক ও আদর্শিক মানসম্পন্ন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের যথোপযুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি।

সমস্যা

গত কয়েক বছর যাবত ব্যক্তি মালিকানাধীন কলেজগুলোর সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক শিক্ষক সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয়করণের ফলে স্বাভাবিক বাছাই প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত হয়নি। এঁদের অনেকেরই সরকারীভাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ছিল না। ব্যক্তি মালিকানাধীন কলেজগুলো জাতীয়করণের পর তাই বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, (১) শিক্ষক উপযুক্ত মানসম্পন্ন না হওয়ায় কলেজ শিক্ষার মান ব্যাহত হচ্ছে। (২) জাতীয়করণকৃত কলেজগুলোর শিক্ষকদের বেতন, পদোন্নতি ও মর্যাদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ফলে এঁদের অনেকেই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। (৩) সরকার ঐ সকল ব্যক্তিগত কলেজের শিক্ষকদের চাকরি মেয়াদের ৫০% সরকারী সার্ভিস হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যদিও তাঁরা আরও অধিক দাবী করে। সরকারী নীতিমালার বাহিরে নিয়োগপ্রাপ্ত ও কর্মরত শিক্ষকগণের ব্যক্তিগত চাকরিকালের ৫০% সরকারী সার্ভিসরূপে গণ্য করার ফলে নিয়মিত সরকারী প্রক্রিয়ায় চাকরিরত অনেকের চেয়ে ঐ সকল অনিয়মিত বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষক জ্যেষ্ঠতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। এই অব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই নিয়মিত শিক্ষকগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। (৪) জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকগণের স্থান দেয়ার জন্য আরও অধিকসংখ্যক পদ সৃষ্টি করা আবশ্যক। এই সংকটরোধে তাঁদের পরামর্শ হলো, পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্তদের ২০% বাতিল করা ও শিক্ষা সার্ভিসের গুণগত মান উন্নয়ন করা। রাজনীতির খাতিরে সরকারী নেতৃবর্গ শিক্ষার মান বিবেচনা না করে, প্রতিক্রিয়া না ভেবে হুজুকের বশে ঐ সকল কলেজ জাতীয়করণ করে, যার বিরূপ প্রভাবে উচ্চশিক্ষা সংকটাপন্ন হয়েছে।

অনুগৃহীত শিক্ষকদের উত্থাপিত দাবী-দাওয়া সরকারের সাথে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে বিবেচ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঐ সকল কলেজগুলোর যত্রতত্র জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুবিবেচ্য নীতি গঠন না করা অবধি আর কোন কলেজ জাতীয়করণ বন্ধ রাখতে হবে। সরকারীভাবে স্বীকৃত কলেজগুলোয় শিক্ষক বেতনের ৮০% সরকার নির্বাহ করে বলে এগুলোর আর্থিক সমস্যার প্রশ্ন ওঠে না, এবং জাতীয়করণ আদৌ জরুরী নয়।

শিক্ষক ঘাটতি

পত্র-পত্রিকায় আমরা প্রায়ই দেখি, দেশের কলেজগুলোতে শিক্ষক ঘাটতির কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। পুরনো নামী প্রতিষ্ঠানেও প্রায় একই অবস্থা বিরাজ করছে। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য এ অবস্থা মোটেই সহায়ক নয়। শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি ও শূন্যপদ পূরণ না হওয়াতেই এরূপ বিঘ্ন ঘটেছে। প্রয়োজনীয় সরকারী তৎপরতা ও যথাসময়ে শূন্যপদ পূরণ না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ভবিষ্যৎ প্রয়োজন ও বর্তমানে বিদ্যমান শিক্ষক পদগুলোর নিয়মানুগ ব্যাপক তালিকা প্রস্তুত না থাকা। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অন্ততঃ পরবর্তী দুই বছরের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তা যথাসময়ে পূরণের ব্যবস্থা করার জন্য নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করা উচিত। সচিবালয় নির্দেশনামা ১৯৭৬, প্যারা ১৮[illegible] সময়ে প্রতিটি কার্য সম্পাদনের নিয়ম পালিত হলে সরকারী কাজে বিলম্ব হওয়ার কথা আসে না।

আদর্শিক মানের শিক্ষার জন্য অবশ্যই যোগ্য শিক্ষক প্রয়োজন। ইতিপূর্বে জোরালোভাবে বলা হয়েছে, যোগ্য শিক্ষকদের যথাবিহিত নিয়মানুগ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করা উচিত। তথাপি কথা থাকে যে, শুধু কড়াভাবে নিয়োজিত হলেও শিক্ষার মান নিশ্চিত হবে না; শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নতির সুযোগ প্রদান করতে হবে।

শিক্ষকের সামর্থ্য উন্নয়ন

আজকাল সরকারী কলেজের শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ নেই। বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতার জন্য দেশীয় উদ্যোগে বিদেশে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। তবে কিছুসংখ্যক বিদেশী বৃত্তির সীমিত সুযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই এ সব উপভোগ করেন এবং অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তারও একটি অংশ হস্তগত করেন, যদিও তাঁদের চাকরিতে এরূপ উচ্চ ডিগ্রীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত নয়, কারণ কোন প্রশিক্ষণ একাডেমী কিংবা বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় সরকারী বিভাগে চাকরিরত না থাকলে উচ্চতর ডিগ্রী অব্যবহৃত থেকে যায়। তাঁদেরকে প্রয়োজনে স্বল্প মেয়াদী ট্রেনিং-এ পাঠানো যেতে পারে। শিক্ষা সার্ভিসের বাইরে অন্যান্য সরকারী চাকুরের উচ্চতর ডিগ্রীর বৃত্তিপ্রাপ্তির নিয়মটি পুরোপুরি ভুল এবং অপ্রয়োজনীয় বিধায় এ আচরণ বন্ধ হওয়া উচিত। বরঞ্চ সরকারী কলেজ শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষালাভের একান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের জন্য অবশ্যই উচ্চ ডিগ্রী লাভ অপরিহার্য। কাজেই তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট কোটা থাকতে হবে। মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উচ্চ ডিগ্রীর এসব বৃত্তিপ্রাপ্তির সুযোগ দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। তবে কলেজগুলোর অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক শিক্ষকই শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে এই সুযোগ লাভ করবে। এরূপ প্রতিযোগিতায় অবশ্য, অধিকাংশ কলেজ-শিক্ষক বিদেশে পড়ালেখার বৃত্তি পাবেন না। বিশেষতঃ ব্যক্তিমালিকানাধীন কলেজ থেকে আসা শিক্ষকদের এ দেশেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, ফিল বা পিএইচডি ডিগ্রীর মানের উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে পাঠানো উচিত। উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে যোগসাজশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের একটি অবিরত নিয়ম প্রবর্তন করা উচিত। উচ্চ ডিগ্রী অর্জনের জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও অর্থ আনুকূল্য প্রদান করে নির্দিষ্ট সময়সীমার ডেপুটেশনে পাঠানো যেতে পারে। তাঁদের অনুপস্থিতিতে ঐ সময়ে শিক্ষাদান পরিচালনার জন্যে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষক পদ পূর্বেই গঠন করে তা যথাসময়ে পূরণ করতে হবে, যেন ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত না হয়।

কলেজ শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষালাভে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ উচ্চ ডিগ্রীসম্পন্ন অধ্যাপকমন্ডলী এবং এই অতিরিক্ত শ্রমের জন্য তাঁদেরকে সরকারের সম্মানী প্রদান করতে হবে। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত মঞ্জুরী প্রদানে সরকারের দ্বিধান্বিত হওয়া উচিত নয়, কারণ বিদেশে প্রেরণের পরিবর্তে দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানে সুফল পাওয়া গেলে তাতে তুলনামূলক ব্যয় স্বল্প হবে। সর্বস্ব বিষয়ে বিজ্ঞ অধ্যাপকগণও দেশের শিক্ষা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার প্রয়াস পাবেন ও সম্মানিত হবেন। বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে না। মেধা গঠন ও প্রসারে দেশীয় সুধীজন বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করবেন।

অনুবাদ: কাওসার পারভিন।